নদীখাতে পলি সঞ্চয়ের ফলে নদী উপরে গ্রাম নিচে। ছবি ঃ অজয় কোনার

সুন্দরবনের নদী তার হারানো জমি ফেরত চাইছে

কল্যাণ রুদ্র

২০০৯ সালের ২৫শে মে সুন্দরবনের ওপর ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীঝড় আইলা ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ সাময়িকভাবে গৃহহীন হন। কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন তার হিসাব নেই। সংখ্যাটা তিনশ হতে পারে তার অনেক বেশিও হতে পারে। সেই সময় একদিন সকালে আমাকে মহাশ্বেতা দেবী ফোন করেন। ফোনে বললেন কি করছ? তখন সকাল সাড়ে আটটা। আমি বললাম দিদি একটা বই পড়ছি। উনি বললেন বইটা বন্ধ করে রাখ। এখন বই পাড়ার সময় নয়। সুন্দরবনের এত মানুষ বিপন্ন ওদের জন্য কিছু করতে হবে। তারপর থেকে মূলত দিদির উদ্যোগে আমরা বেশ কয়েক জন বন্ধু বান্ধব মিলে বেশ কয়েকবার সুন্দরবনে গেছি এবং ওই মানুষদের কাছে সামান্য কিছু বেঁচে থাকার উপকরণ পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি। তীব্র জল কষ্ট, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা।

আমরা কুমিরমারি বলে একটি গ্রামে আইলার কয়েক দিন পরে পৌঁছেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার কথা শুরুতে উল্লেখ করি। সামান্য কিছু ত্রাণের জিনিসপত্র নিয়ে আমরা কুমিরমারি গ্রামে পৌঁছেছি। যারা নিতে এসেছেন তারা মূলত শিশু এবং কিছু বৃদ্ধ মানুষ। কিছু ক্ষণ চলার পর আমি একজন বয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম সব শিশুরা লাইনে দাঁড়িয়েছে, পুরুষেরা কোথায়? বৃদ্ধ বললেন পুরুষেরা সব চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে কলকাতা বা অন্যত্র। বললাম তাহলে মায়েরা কোথায়? বললেন বৃদ্ধ মায়েরা অনেকে আছেন কিন্তু তারা এখন আসতে পারবে না। আমি বললাম কেন? বললেন যখন আইলা হয় তখন ওরা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই কোন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং যখন কয়েকদিন পর ফিরে আসে তখন তাদের সমস্ত ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। ওদের একটাই কাপড়। স্নানের সময় সেই কাপড় ধুয়ে শুকোতে দিয়েছে। মায়েরা এখন তাই কেউ আসতে পারবে না। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর শিহরণ খেলে গেল,আমার সমস্ত নাগরিক সভ্যতা যেন একটি থাপ্পড় মারল আমার গালে। একজন মানুষ যাকে আমরা চলতি কথায় আদিবাসী বলি

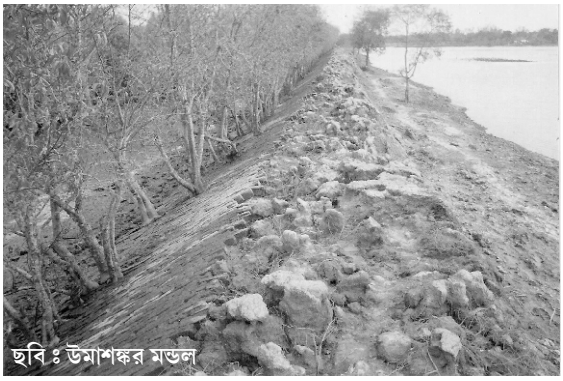
ছবি ঃ উমাশঙ্কর মন্ডল

তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার কি ক্ষতি হয়েছে? বললেন আমার কিছু ক্ষতি হয়নি। আমি বললাম এই যে সবাই বলছে ক্ষতি হয়েছে। বললেন, ওদের একটু ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর ছিল ওদের ক্ষতি হয়েছে। আমার তো কিছু ছিল না, আমার কিছু ক্ষতি হয়নি। কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে এই হচ্ছে সভ্যতার অগ্রগতি, স্বাধীনতার ৬২বছর পরে।

সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে আইলাতে ৪০০ কিলোমিটার নদী বাঁধ ভেঙে গেছে এবং ১৯৫৬ কিলোমিটার বাঁধের উপর দিয়ে জল গেছে। আমরা গিয়ে দেখছি তখনও বিস্তীর্ণ কৃষি জমি লবণাক্ত জলে পূর্ণ হয়ে আছে। গবেষক হিসাবে আমার একটি কৌতূহল হয়েছিল, এই ভয়ঙ্কর ক্ষয় ক্ষতি হল এর দায় কি শুধু প্রকৃতির? একটি আইলা, একটি সামুদ্রিক জলোচ্ছাসেই কি এই তাণ্ডব হল? এর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে যেটি বেড়িয়ে আসছে সেটি বড় ভয়ঙ্কর কথা।

সুন্দরবন হচ্ছে এমন একটি এলাকা যাকে আমরা বলি সক্রিয় ব-দ্বীপ। এখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় নদী এবং দ্বীপ। এর পশ্চিম দিকটি ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্বু উদ্ভিদের ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এক সময় এই সুন্দরবনের অংশ ছিল আজকের কলকাতাও। ১৭৭০ সাল থেকে সাহেবরা জঙ্গল কেটে সুন্দরবনের পশ্চিম দিকটি ধীরে ধীরে পরিষ্কার করতে শুরু করে। তাদের ঔপনিবেশিক চিন্তা ভাবনা ছিল এবং লাভের উদ্দেশ্যেই তারা সুন্দরবন পরিষ্কার করতে শুরু করেন। প্রায় ৫ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সুন্দরবনের আর একটি সমস্যা ছিল, সুন্দরবন হচ্ছে অপরিণত ব-দ্বীপ, এখানে ভূমি গঠনের প্রক্রিয়াটিশেষ হয় নি। অর্থাৎ এমন একটি এলাকা যেটি গড় সমুদ্র তল থেকে দেড় থেকে তিন মিটার মাত্র উঁচু। আর ওখানে ভরা জোয়ারের নদীগুলি ফুলে ফেঁপে ওঠে প্রায় পাঁচ মিটার। ফলে সুন্দরবন প্রায় দুই থেকে আড়াই মিটার জলের তলে চলে যাবে যখন ভরা জোয়ার-এটাই স্বাভাবিক। সাহেবরা দেখল এইভাবে তো চাষ করা যাবে না। অতএব আবার প্রকৃতিকে শাসন করো। প্রথম পর্বে জঙ্গল কেটে সাফ হল আর দ্বিতীয় পর্বে নদীর দুই পার মাটি দিয়ে উঁচু করে বাঁধ বেঁধে দিল। যাতে জোয়ারের জল পাশের জমিতে ঢুকতে না পারে। মেদিনীপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে তথাকথিত আদিবাসী মানুষদের নিয়ে আসা হল এই সব জঙ্গল হাসিল করে সেখানে চাষআবাদ করার জন্য।

এখন সুন্দরবনে নদী বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার। সারা পশ্চিমবঙ্গে নদী বাঁধের দৈর্ঘ্য সাড়ে দশ হাজার কিলোমিটার, তার মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ আছে সুন্দরবনে। এই বাঁধ বেঁধে দেওয়ার ফলে প্রথম অবস্থায় সাহেবরা যা চেয়েছিল তাই হল। পাশের প্লাবন ভূমিতে জোয়ারের জল ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ইউরোপের নদী শাসনের যে অভিজ্ঞতা থেকে সাহেবরা এই কাণ্ডটি করেছিল, তারা এই দেশের নদী নালাকে ভাল করে চিনতো না। কারণ এ দেশের নদী প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করে। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র পৃথিবীর বৃহত্তম এই ব-দ্বীপটি তৈরি করেছে। সে বছরে একশ সাতষট্টি কোটি টন পলি বহন করে নিয়ে আসে, পৃথিবীতে আর কোন নদী এত পলি বহন করে না। সেখানে ভূমি গঠনের কাজ শেষ হয়নি। যেই বাঁধ দেওয়া হল প্লাবন ভূমিতে পলি সহ যে জল ঢুকতো সেটি ঢোকা বন্ধ হয়ে গেল। যখন ভাঁটার জল ফিরতো সে পলিটিকে ফেলে রেখে আসতো। এই যে পলিটিকে ফেলে রেখে আসতো এতে দ্বীপ ধীরে ধীরে উঁচু হতো। আর নদীখাত গভীর থাকতো। এই ছিল প্রকৃতির ভারসাম্য। ওরা কি করল, নদীর দুই পার উঁচু করে বেঁধে দিল ফলে নদী তার পলিগুলোকে আস্তে আস্তে খাতে জমা করতে শুরু করল। খাত অগভীর হতে লাগল। জলস্তর আস্তে আস্তে উঁচুতে উঠতে লাগল। সাহেবরা আরো শক্ত করে বাঁধ বাঁধতে লাগল। বাঁধকে আরো উঁচু করতে লাগল। আজকে প্রায় আড়াইশ বছর পরে আপনি যদি কখনো ভরা জোয়ারে সুন্দরবনের ভিতরে ঢোকেন তাহলে দেখবেন নদী ওপরে, পাশের গ্রাম নীচে। এই অবস্থাটি একদিনে সৃষ্টি হয়নি।

দুর্ভাগ্যের কথা স্বাধীনতার পরে যারা নদী শাসনের দায়িত্ব নিলেন তাঁরা দেশেরই নাগরিক, তাঁরা বি.ই. কলেজ বা আই.আই.টি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও নদী শাসনের যে দর্শন বা ফিলজফিটি ঢুকিয়ে দেওয়া হল সেটিও ব্রিটিশ ইনস্টিটিউশন থেকে ধার করা। ইউরোপ আমেরিকার নদীগুলোর সাথে এদেশের নদীগুলোর কোন মিল নেই। সুন্দরবনের নদীর চরিত্র একেবারে ভিন্ন ধরণের, আমরা ধরে নিলাম শক্ত করে বাঁধ বাঁধতে পারলেই নদী বাঁচবে। আমরা ধরে নিলাম সভ্যতাকে বাঁচানো যাবে। আইলা একবার দেখিয়ে দিল, তুমি শিশু মাত্র।

এঙ্গেলস তাঁর ডাইরেকটিভস অফ নেচারে এক জায়গায় বলেছেন প্রকৃতিকে তুমি জয় করেছো। এটি ভেবে বেশি তৃপ্ত হোয়ো না। প্রতিটি জয়ের জন্য প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ চাইবে। প্রথম দিকে হয়তো কিছু সুফল পাবে। তারপর আস্তে আস্তে কুফলের মাত্রাটি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে যে তোমার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

যে সব দ্বীপে জঙ্গল আছে, বাঁধ নেই, সেখানে স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটা খেলছে। সুন্দরবন গেলে দেখতে পাবেন এখানকার প্রকৃতির এমন নিয়ম যে দেখবেন গাছের পাতায় জল লেগে আছে। আইলা যেদিন হল, তারপর দিনই জঙ্গল এলাকা থেকে জল নেমে গেছে ভাঁটার সময়। কিন্তু যে এলাকায় বসতি আছে সেখান থেকে জল নামার রাস্তা নেই। আমরা তো দু পার বাঁধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। সেখানে নদী উঁচুতে গ্রাম নীচে। প্রায়

দু'মাসের বেশি সময় বিভিন্ন গ্রামে জল জমে ছিল। তীব্র লবণতা মাটি গ্রহণ করল।

চুয়াল্লিশটা ঘূর্ণিঝড় বিংশ শতাব্দীতে সুন্দরবনের উপর আছড়ে পড়েছিল। তারমধ্যে আইলা একটি ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমটি হচ্ছে এই ওটা ২৫শে মে বৃষ্টি হওয়ার আগে (তখনও দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আসে নি) এসেছিল। মাটি একেবারে শুকনো ছিল। সেই সময় বঙ্গোপসাগরে জলের লবণতাও সবচেয়ে বেশি থাকে। যেই লবণাক্ত জল বাঁধ ভেঙে বা বাঁধ টপকে চাষের জমিতে বা গ্রামে ঢুকল, শুকনো মাটি সেই লবণজল টেনে নিল। তারপরে আর সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ করা যায় নি।

আমাদের দেশের কৃষি সভ্যতা দশ হাজার বছরের পুরোনো। আমাদের দেশের কৃষকরা জানতেন কীভাবে বিভিন্ন এলাকায় চাষ করতে হয়। তাঁরা শুখা এলাকায়, বন্যা প্রবণ এলাকায় আলাদা আলাদা ফসল চাষ করতেন। তাঁরা কেউ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়র না হয়েও এমন ধানের বীজ তৈরি করেছিলেন যে আঠারো ফুট পর্যন্ত লম্বা সেই ধান বন্যা প্রবণ অঞ্চলে ফসল দিত। আইনি আকবরী পড়লে জানা যাবে বাংলার কৃষকদের এই অসাধারণ দক্ষতার কথা। ৫৭০০ প্রজাতির ধানের বীজ এই বাংলায় পাওয়া যেত। এটি সরকারী প্রতিবেদন। তথাকথিত সবুজ বিপ্লব যখন এলো তখন দেশজ এই বীজগুলোকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে (ধ্বংস করে দিয়ে) কিছু বিদেশী বীজ নিয়ে আসা হল। যেগুলো এ দেশের প্রকৃতির সাথে খাপ খায় না। প্রাথমিকভাবে কিছু খাদ্য উৎপাদন বাড়ল। কিন্তু এখন যদি সুন্দরবনের দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন এখানকার কৃষি প্রবল সংকটে। এই সংকট কিন্তু সারা ভারতের কৃষি ব্যবস্থাতেই।

আমাদের দীর্ঘদিনের গবেষণায় দেখেছি সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা অনেক উঁচু এবং গ্রামগুলো অর্থাৎ যেখানে জোয়ারের জল ঢুকতে দিই নি সেখানকার জমি অনেক নীচু। সুন্দরবন অঞ্চলের একজন কৃষকের সাথে কথা বলছিলাম - বললাম এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে রক্ষার উপায় কি বলুন তো? বললেন কোন উপায় নেই, একমাত্র উপায় হচ্ছে আমরা যদি বাঘেদের বলি তোমরা এপারে এসো আমরা ওপারে তোমাদের জঙ্গলময় উঁচু দ্বীপগুলোতে থাকব।

এদিকে আর একটা সমস্যা হলো সমুদ্র ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আমি গত দুশো বছরের গাঙ্গেয় বদ্বীপের ম্যাপগুলোর তুলনা করছিলাম। রেনেল সাহেব প্রথম ম্যাপ করেছিলেন ১৭৬৪ থেকে ১৭৬৭ সালের মধ্যে। সেটি ১৭৮০ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তার ম্যাপের সাথে যদি আপনি একটি আধুনিক উপগ্রহ চিত্রকে তুলনা করেন আপনি দেখবেন সুন্দরবনের চেহারা আমূল বদলে গেছে। ফলে একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে সুন্দরবন। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রই কিন্তু কলকাতাকে রক্ষা করে। আইলা এবং সামুদ্রিক ঝড়গুলো অনায়াসে উত্তরদিকে এগিয়ে আসতে পারে না। যেহেতু ঐ ঘন অরণ্যই বাধা দেয় তাকে। নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে আজ যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে আমি আপনি নিরাপদ নয়।

একটি জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার, যে নীতি নিয়ে সুন্দরবনকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে সুন্দরবনের ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। তাহলে করণীয় কি? ভারতীয় সুন্দরবনে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের বাস। এই মানুষগুলোকে এখনই সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আবার যদি বলেন বাঁধ ভেঙে দেওয়া হোক তাও সম্ভব নয়। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রাম জলের নীচে চলে যাবে জোয়ারের সময়। কিন্তু আইলা একটি শিক্ষা দিয়ে গেছে- যে ১৯০০ কিলোমিটার বাঁধের ওপর দিয়ে জল গেছে সেটি যদি কংক্রিটের হতো তাহলেও যেত। সমস্যাটি বাঁধটি মাটির, না সিমেন্টের, না স্টিলের সেটি নয়। সমস্যাটি হল জোয়ারের সময় জলের যে উচ্চতাটা হয়েছে সেই উচ্চতাটা। নদীর জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। কাজটি খুব সহজ নয়। আড়াইশো বছর আগে নদীর যে প্লাবনভূমি আমরা দখল করে নিয়েছিলাম নদী এবার সেটি ফেরত চাইছে। এই ফেরত দেওয়াটি খুব জরুরী। বাঁধটি অন্তত কিছুটা সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। যাতে কিছুটা জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। বাঁধের উচ্চতা বাড়িয়ে সুন্দরবনকে রক্ষা করা যাবে না। কিন্তু পারের এলাকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ, যদি বাঁধ সরাই তাহলে মানুষগুলোর কি হবে?

যে জায়গাগুলোতে বাঁধের সামনে ম্যানগ্রোভ ছিল সেখানে বাঁধের ক্ষতি কম হয়েছিল। বাঁধের সামনে ম্যানগ্রোভ লাগাতে পারলে সে বাঁধকে রক্ষা করবে।

সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের ভূমি ব্যবহারের একটা বিজ্ঞান সম্মত নীতি নির্ধারণ করা দরকার। প্রকৃতির সাথে বিরোধিতা করে নয়। প্রকৃতির সাথে সহাবস্থান করতে হবে। নদীর গতিশীল চরিত্রকে বুঝতে হবে। নদীর জল প্রবাহের জন্য কতটা জায়গা দরকার তা জানতে হবে। এই অঙ্কগুলো করা খুব কঠিন নয়। এ দেশেও বহু মানুষ আছেন যাঁরা নদীগুলো হাতের পাতার মত চেনেন। স্থানীয় মানুষদের অভিজ্ঞতাও জানা প্রয়োজন। সকলের মত নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নীতি নির্ধারণ করলে তবেই সুন্দরবনকে বাঁচানো সম্ভব।

ছবি ঃ তানিয়া দাস